# সুরূপা-স্বরূপা

বাণী বসু

জ্ঞান হয়ে থেকে আমি আমার মাকে দেখিনি। শুনেছি, আমি জন্মেছি বলেই মা মারা গেলেন। 'দু দিন যায়... তিনদিন যায়' আমার ঠাম্মা চোখ গোল্লা গোল্লা করে বলেন— 'তা'পর আমাদের চোখের সামনে অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা বউ আমার চোখ বুজলো'। আমি বলি— তাহলে ব-পিসি হবার সময়ে তুমি কেন চোখ বোজনি?

ঠাম্মা ঢোঁক গেলেন, ভুরু কুঁচকে বলেন— 'বাপ রে, মেয়ে তো নয় উকিল-ব্যারিস্টারের বাপ। নাও, এখন বোঝাও। আরে তোর মায়ের যে আগে থেকেই একটা বুকের দোষ ছিল!' আমার ধাঁধা লেগে যায়। তা হলে সেই বুকের দোষটাই তো মাকে মেরেছে, আমি তো মারিনি! তবু কেন সকলে আমাকে মা-খাকী বলবে! কেন বাবা আমার ছায়া মাড়াবে না!

আমি কালো, আমার গায়ে খড়ি, আমার চুল খ্যাংরাকাটির মতো। আমার চোখ হাতির চোখ, নাক বড়ি, ঠোঁট যেন দশ পয়সা। আমি একটা টিপসি। পিপড়ে কামড়ালেও চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি, কথা শুনি না, যেটা বারণ করা হবে সেটাই আমি করবো, অবাধ্য, অসভ্য, আমাকে আদব শেখানো আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা। তার ওপর আমি ঝগড়াটি, এতটুকু সহ্য নেই। কেউ একটা কথা বললে আমি দশটা কথা শুনিয়ে দিই, কেউ যদি একটা চড় মারে, আমি তাকে শুইয়ে ফেলে তার ওপর চড়ে বসি, ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে দিই বুকের মাংস ঠিক যেন ভীম, দুঃশাসনের রক্তপান করছি। হ্যাঁ এই একটা জিনিস আমার আছে, প্রচণ্ড গায়ের জোর। রাগলে না কি আমার হাতির চোখই ভাঁটার মতো হয়ে যায়, জ্বলতে

থাকে, তখন আমি যা সামনে পাবো ভাঙবো চুরবো ভোঁস ভোঁস করে ফুঁসবো, যেন জাত-গোখরো।

সবাই বলে অমন মায়ের যে এমন মেয়ে কী করে হয়! তার সাত চড়ে রা ছিল না, মুখে সবসময়ে হাসি, মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত!

তা সে তো আমি দেওয়ালে টাঙানো, ফটো-ফ্রেমের মধ্যে, টেবিলের ওপর সবসময় দেখছি। ঠিক যেন ঠাকুর দেবতা! আমার দিম্মা পাশকুড়োয় থাকেন, বলেন, ফটোর বাইরের মা ফটোর মায়ের চেয়েও সুন্দর ছিলেন। মাটিতে পা ফেললে মনে হত পদ্মফুল ফুটে উঠল। কথা কী! যেন মধু ঝরছে! আমার মাসিরাও ফর্সা, পিসিরাও তো কালো নয়, কিন্তু মায়ের কাছে সবাই কালো। পিসিরাই বলে মা যখন বউ হয়ে এসে দুধে-আলতায় পা রাখলেন, দুধে-আলতার থেকে মায়ের পা আলাদা করা যায়নি। পিসিরা সব মুখ লুকিয়ে ফেলেছিল। জেঠু, যিনি সবসময়ে টেবিল-চেয়ারে পড়াশোনা করেন তিনি বলেন, 'পুটু কাউকে বলো না, বেশি খাটো নয়, বেশি লম্বা নয়, মোটা নয়, রোগা নয়, তোমার মা ছিলেন পদ্মিনী নারী। পদ্মপলাশের মতো চোখ, পাখির ডানার মতো ভুরু, বাঁশি-হেন নাক, মুক্তা-জিনি দাঁত, জ্যোৎস্নার মতো হাসি। ওঁরা স্বর্গের পরী, দেখলে আমাদের মতো মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। মানুষ ওঁদের ধরে রাখতে পারে না।' চন্দননগরের বড় মাসি বলেন, 'তোর মা শুয়ে থাকলে মনে হত ভোরের প্রথম সূর্যের আলো পড়ে রয়েছে, বসে থাকলে মনে হত রূপকথার পাতা থেকে একটা ছবি কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতো না যেন হালকা হাওয়ায় পাখির মতো উড়তো, আর চুল? সে এক ঢেউ-খেলানো মিশমিশে কালো জলপ্রপাত।'

বড়মাসি আর দিদিমা বলাবলি করতেন, ভেবেছিলুম কোন রাজবাড়িতে বুঝি রানি হয়ে যাবে। তা আমাদের মতো লোকের কপালে আর...।

মা না কি ছিলেন ভদ্র, বিনীত, হাসিমুখ, সবার কথা ভাবতেন, সবাইকে সুন্দর দেখতেন, ভালোবাসতেন, তাই সব আত্মীয়-স্বজন কুটুম পাড়া-পড়শিও ছিল তাঁর আপনজন। কোনওদিন মুখের ওপর কাউকে একটা কথা বলতেন না। আমার একেবারে উল্টো।

যে যখন মায়ের কথা বলতো এমনিভাবেই বলতো। আর তখনই একমাত্র আমি শান্তশিষ্ট হয়ে বসে-বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেসব কথা শুনতুম। সমস্ত দুষ্টুমি, দস্যিপনা, অবাধ্যতা ঘুচে যেত। আসলে আমার চোখের সামনে থেকে তখন অদৃশ্য হয়ে যেত ঠাম্মা-পিসি-কাকা-জেঠুদের, দিম্মা-বড়মাসি-দাদু সব্বার মুখ। বাড়ির দরজা-জানলা-দেওয়াল যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে কোথায় মিলিয়ে যেত। মেঘ করে আসত চারদিক থেকে, ঘন নীল মেঘ, আর হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক অপূর্ব মূর্তি ঝলসে উঠতো সেখানে। আমার চোখ, মন, সব স-ব দিয়েও আমি সে মূর্তির পষ্ট চেহারাটা দেখতে পেতুম না। মনে মনে বলতুম, মা আমি কেন তোমার মতো নয়? আমি কি কোনওদিন তোমার মতো হতে পারবো না? অনেক সময়ে সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করে ফেলতুম।

—দিম্মা, আমি কি কোনওদিনও মায়ের মতো হতে পারবো না? যখন অনেক বড় হয়ে যাবো, তখনও না?

দিদিমা বলতেন, কেন পারবে না? চেষ্টা করো। সবার কথা শোনো, লেখাপড়া করো, চেঁচিও না, ঝগড়াঝাঁটি করো না, লক্ষ্মী হয়ে যা দেওয়া হবে খেয়ে নেবে, সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে, যে যা বলবে শুনবে...

—সব শুনবো কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেও শুনবো? কুমড়ো আর ঝিঙে খেতে বললেও খাব?

—হ্যাঁ, সব শুনবে। সব খাবে।

আমার ধৈর্য থাকতো না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলতুম, তা হলেই আমার দুধে আলতার মতো রঙ, পদ্মপলাশের মতো চোখ, আর জোছনার মতো হাসি হয়ে যাবে? তাহলেই আমার গানের মতো গলা, মধুরের মতো কথা হয়ে যাবে? তা হলেই সব্বাই আমায় ভালোবাসবে?

—বাসবেই তো! লক্ষ্মী হও, তাহলেই সব্বাই ভালোবাসবে।

দিম্মা আমার আসল ইচ্ছের কথাগুলো কেমন এড়িয়ে গেলেন!

আর বাবা মানে রাঙাদা! বাবার কথা বলতে তো ভুলেই যাচ্ছি। বাবা আমার একটা কষ্টের জায়গা টিপলে লাগে। বাবার কথা আমি বলি না। কাউকে জিজ্ঞেসও করি না। বাবা আমার দেখা জ্যান্ত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। কীরকম দুঃখী-দুঃখী উদাস চোখ, কিন্তু আবার ভীষণ গম্ভীর কথাবার্তা। যখন কথা বলেন ঝকঝকে দাঁত দেখা যায় ঘন তামাটে রঙের ঠোঁট দুটোর মধ্যে দিয়ে। বাবার পায়ের পাতা কী ফর্সা! নখে যেন ছোট ছোট গোলাপি আয়না বসানো আছে, সুন্দর শাদা ফ্রেমে বাঁধানো। বাবা সকাল আটটায় টাইস্যুট পরে বেরিয়ে যান, রাত্তির দশটা এগারোটায় ফেরেন। একটু দাঁড়ান, ঠাম্মার সঙ্গে দু'চারটে কাজের কথা বলেন। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে যান। একটু পরে ফের বন্ধ দরজা খোলে, ভেতর থেকে ভরভর করে ভেসে আসে সিগ্রেটের গন্ধ। আমি নাক ভরে গন্ধটা উশ্‌শ্‌শ্ করে টেনে নিই। এটা রাঙাদার গন্ধ। মানে আমার বাবার।

পর্দার কোনটা একদিন মুঠো করে ধরেছি। অমনি ভেতর থেকে গম্ভীর গলা, —কে? কে ওখানে?

আমি দুড়দাড় করে পালাতে থাকি। পা পিছলে পড়ে যাই। ধড়াম করে শব্দ হয়। ভীষণ লাগে। কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার সামলাই। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। ঠোঁট ফোলে। বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। পেছন থেকে একটা আলোর ঝলক, একটা গন্ধের ঝলক।

—মা-আ—বাবা ডাকতে থাকেন, ঝুমা—আ, তিলু— উ-উ... পড়িমরি করে সব ছুটে আসতে থাকে। আমি তখন মুড়ে-পড়া ডান হাঁটুটাকে প্রাণপণে সোজা করবার চেষ্টা করছি। ব্যথায় চোখ ফেটে জল আসছে, কিন্তু চিৎকার আসতে দিচ্ছি না। তবে আমার দিকে কেউ দেখলো না, সবার দৃষ্টি রাঙাদার দিকে।

—কী রাজেন? কী হয়েছে? কী হয়েছে রাঙাদা?

—একটা বাচ্চাকে সামলে রাখতে পারো না? বাড়িতে এতগুলো লোক! দেখো তো! পড়ে গেছে। ভীষণ লেগেছে বোধহয়।

—ওরকম দুদ্দাড় ও দিনরাত পড়ছে, যা দস্যি, ও সব আদিখ্যেতার কান্না, তুই যা, আমি দেখছি।

ব্যস রাঙাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। এইবারে আমি হাঁ-হাঁ করে কাঁদতে থাকি।

বড়পিসি বলে, এতক্ষণ তো চেঁচাচ্ছিলি না? যেই আমাদের দেখলি অমনি কম সেয়ানা না কি তুই? শেয়ালও তোর কাছে ছ্যাঁচড়ামিতে হেরে যাবে।

ছোটপিসি বলে, বকুনি খাওয়াতে ওস্তাদ! মেয়ে তো নয় রাক্কুসি একখানা! ঠাম্মা বলেন, আমি রাজার রুটির ময়দা আধমাখা করে রেখে এসেছি। আমার দাঁড়াবার জো নেই। ওকে তোল। দ্যাখ আবার কী ভোগান্তিতে ফেলল! কত করে বলছি একটা বিয়ে কর, বিয়ে কর, হাড় মাস আমার আলাদা হয়ে গেল!

গোড়ালি মচকে গেছে, ডান হাঁটুতে ভীষণ লেগেছে। পিসিরা দু'জনেও তুলতে পারল না, জেঠু এলেন। বললেন, 'এত চেঁচাচ্ছে যখন নির্ঘাৎ ভেঙেছে।

পিসিরা বলল, 'ও ওইরকম আউপাতালি। চুনে-হলুদে গরম করে লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। উঃ দু দণ্ড শান্তি দেবে না!'

কাকু কোথা থেকে এসে ফুট কাটল—এই আহ্লাদি! এখন দেড়মাস পা সোজা করে শুয়ে থাকবি। নইলে খোঁড়া!

আমি চেঁচিয়ে বললুম, বেশ করব দৌড়াব, দৌড়ে তোমার ঘরে চলে যাবো, তোমার বইপত্তর হণ্ডুল-মণ্ডুল করে দেবো। তোমার চাদর বালিশ সব ছিঁড়ে দেবো।

—উঃ, বউদির মেয়ে যে কী করে এমন হয়! কাকা বিরক্ত হয়ে বলল।

—রাক্কুসি একটা, আসল রাক্কুসি—ছোটপিসির মন্তব্য।

তা আমি তো রাক্কুসি; লকলকে জিভ বার করে মুখ ভেংচে পাশ ফিরে শুই। ওদের দিকে পেছন ফিরে। পায়ে আবার লেগে যায়। চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে। সামনে আমার কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু খানিকটা শাদা দেওয়াল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আমি চোখ বুজিয়ে ফেলি, হাতজোড় করে মনে মনে বলতে থাকি, হে দেওয়াল! হে দেওয়াল! তুমি কার?

দেওয়াল বলে, আগে ছিলুম টিকটিকির, এখন তোমার।

আমি বলি, তুমি যদি সত্যিকারের দেওয়াল হও তাহলে আমাকে মায়ের মতো করে দাও।

দেওয়াল যেমনি সাদা, তেমনি থাকে। উত্তর দিলে দেওয়ালে একটা ছায়া পড়ে আমি দেখেছি। আজকে কোনও ছায়া পড়ে না।

যন্ত্রণায় আমি ঘুমোতে পারি না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকি। তখন অবশেষে আমাদের প্রকাশদাদু ডাক্তারবাবু আসেন। একটু টিপে-টুপে আমাকে আরও কাঁদিয়ে শেষে বলেন, এক্স-রে করলে ভালো হত।

ঠাম্মা বললেন, বাপরে, ওই আউপাতালি মেয়েকে নিয়ে এক্স-রে করতে যাওয়া! সে যে ভীষণ হাঙ্গামা!

প্রকাশদাদু বললেন, এইগুলো আপনারা ঠিক করেন না। সেবার বললুম একটা ই.সি.জি. ইকো-কার্ডিও, টি.এম.টি. করিয়ে আনতে তা সে তো করালেন না। মানুষটা একরকম বেঘোরে...

ঠাম্মা চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, কী করে বুঝবো ভাই, দিব্যি, ভালো মানুষ, মাঝে মাঝে চোখে সব আঁধার দেখে। এখন, সে তো আমরাও চব্বিশ ঘণ্টাই দেখছি, দেখছি না?

—ঠিক আছে। হেয়ার-লাইন ফ্র্যাকচার একটা হয়েছে মনে হচ্ছে পায়ের পাতায়, যদি বলেন আমি প্লাস্টার করে দিতে পারি।

—কিছু গণ্ডগোল হবে না তো!—জেঠু বললেন।

—মনে তো হয় না।

—শেষে আবার পা বেঁকে-টেঁকে যাবে না তো! বিয়ে দিতে পারবো না তাহলে!

—আমার ওপর ভরসাটা যখন এতদিন রেখেছো, তো আরও কিছুদিন রাখো!

—উঃ দেড়মাস! মানে ছ সপ্তাহ, মানে ছ সাত্তে বিয়াল্লিশ দিন! পায়ে ভারী প্লাস্টার হাঁটু পর্যন্ত! আর চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা! তেমন ব্যথা লাগতো না আর! কিন্তু অধৈর্যে, বিরক্তিতে আমি চেঁচাতুম। মাঝে মাঝে পরিত্রাহি একেবারে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। শুয়ে-শুয়ে আমার খেয়াল থাকতো না কী তারিখ, কী বার। অনেকক্ষণ গল্পের বই পড়ছিলুম, পাশ ফিরতে গিয়ে অসুবিধে হল, তখনই দপ করে মনে পড়ে গেল— ও মা! কেন আমি খালি খালি গল্পের বই পড়বো? কেন চুপচাপ থাকবো? এমন একা একা? কেন কেউ না কেউ আমার বিছানার পাশে থাকবে না! আমার তো অসুখ! বড়পিসির তো সামান্য টাইফয়েড হয়েছিল, ছোটপিসি কিংবা ঠাম্মা তখন ঠায় বিছানার পাশে বসে থাকতো না? কাকু বারবার এসে জিজ্ঞেস করতো না? গল্প করতো না? আর আমার যে পা-টাই ভেঙে গেছে? এটা বুঝি আরও অসুখ নয়? তখন আমি আঁ-আঁ করে একটা চিৎকার দিয়ে উঠলুম। বাইরে পায়ের শব্দ। দৌড়ে নয়, কিন্তু বড় বড় পা ফেলে কেউ আসছে। কে রে বাবা! এ তো আমার চেনা শব্দ নয়! তারপরই দেখি সব্বোনাশ! দরজার চৌকাঠে রাঙাদার চেহারা। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারটা গিলে নিয়েছি।

—কী হল? লাগছে খুব? থেমে থেমে বললেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, না।

—তা হলে?

আমি কোনও জবাব দিই না। শিটিয়ে শুয়ে থাকি।

—স্বভাব, আর কী!—বড়পিসি ঢুকতে ঢুকতে বলল।

—আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করছি পুঁটুকে। কী হল? লাগছে না, তাহলে কাঁদছো কেন?

—কাঁদিনি, চেঁচিয়েছি।

—ভালো। তা চ্যাঁচালে কেন? অমন বিকট গলায়?

—ওর গলাটাই অমন। হেঁড়ে, খ্যানখেনে। বউদির মেয়ের যে এমন গলা হয় কী করে?— বড়পিসি গড়গড় করে বলে গেল।

—তোমার কমেন্ট আমি শুনতে চাইনি ঝুমা, পুঁটু জবাব দাও।

তখন বলি, আমার একা-একা শুয়ে থাকতে আর ভাল্লাগছে না।

—তোমরা কেউ ওর কাছে একটু বসতেও পারো না? আশ্চর্য! একটা দিন রোববার, তা-ও বাড়ি থাকবার জো নেই।

রাঙাদা বেরিয়ে গেলে পিসি আমায় চাপা গলায় ধমক দিল— তোকে তো 'ভোম্বল সর্দার' দিয়ে গেলুম। তখনই তো এলুম ঘরে। রাঙাদাকে মিছে কথা বললি?

—পাঁচটা ছটা আটটা পাতা পড়েছি। আর ভাল্লাগছে না।

—আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তোর কাছে বসতে হবে? জানিস তিন মাস পরে আমার একটা মস্ত পরীক্ষা!

—তো এখানে বসে পড়া করো না!

—তুই তো খালি কথা বলিস, বিরক্ত করিস।

—কথা বলবো না, বিরক্ত করবো না।

সত্যি-সত্যি আমি বড়পিসিকে একটুও বিরক্ত করিনি। যে-ই পাশ ফিরিয়ে পিসি বালিশটা আমার পায়ের নিচে ঠিকঠাক বসিয়ে দিল, আমি সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলুম। খাট, তারপর ফাঁকা, একদিকে বড়পিসি, একটা চেয়ারে বসে পড়ছে, জানলার দিকে মুখ। আরও খানিকটা ফাঁকা, পাশ-দেওয়ালে মস্ত বড় আলমারি, তার ওদিকে দেওয়াল। দেওয়ালটা আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধু। কিন্তু আমাদের বাড়ির এই সব মুখগুলোকেও আমি ভীষণ ভালবাসি। ওই যে বড়পিসি জানলার পাশে বসে কী পড়ছে, চুলগুলো ঝুলে পড়েছে সামনে, চুলের ফাঁক দিয়ে বড়পিসির গাল, গালে একটা মাছির মতো আঁচিল, নাকের ডগাটা পষ্ট। এখন পিসির মুখে কোনও বিরক্তি নেই, বকুনি নেই। আমার ইচ্ছে করছে পিসি একবারটি এপাশ ফিরে আমার দিকে তাকাক, একবারটি বলুক, 'লক্ষ্মীসোনা!' আমি তো একেবারে লক্ষ্মীসোনার মতোই চুপটি করে রয়েছি। তাহলে বলছে না কেন? কে-ন বলছে না! বললে তো আমিও পিসিকে আদর করে দেব। কিন্তু পিসি একবারও আমার দিকে তাকায়ই না!

ছোটপিসিকেও তো আমার ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ছোটপিসি আবার আর এক। দলবেঁধে ওর বন্ধুরা এসেছিল সেদিন। আমি অতগুলো পিসি দেখে ছুটতে ছুটতে গেছি, আমার হাতে নরম ভালুক পুতুল ছিল, জামার পেছনে তিনটে বোতাম ছিল না, কাঁধ থেকে খসে পড়ছিল তাই, খালি পায়ে অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছি, পা ধুলোয় ভরা। আমি জানি এইরকম করে বাইরের লোকের সামনে যেতে হয় না। কিন্তু কী করবো, আমাদের আলনায় যে আর জামা ছিল না! ওদিকে অতগুলো পিসি!

ঢুকতেই পিসির দল হই-হই করে উঠলো—

—তিলোত্তমা! এই তিলোত্তমা—এই বুঝি তোর রাজকন্যে বউদির মেয়ে?

—এই বুঝি তোর রাঙাদার মেয়ে!

—একমাত্র না রে?

—হ্যাঁ। ও হওয়ার পরই তো বউদি...

—কী স্যাড্ না?

তারপরেই সেই সব কথা।— একদম বোঝা যায় না, না?

—তোর রাঙাদার মতোনও নয়। বউদির মতো তো নয়ই! কার মতো বল তো?

ছোটপিসি মুখটা কেমন বাঁকিয়ে বলে, আমার মতোন নয় এটুকুই বলতে পারি। কে জানে কোত্থেকে এসেছে!

আমি তখন মাথার চুল ঝাঁকিয়ে হেঁকে হেঁকে প্রত্যেকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, তোমার মতোন, তোমার মতোন, তোমার মতোন?

পিসিরা খুব হাসে, বলে, বেশ খরখরি আছে, না?

ছোটপিসি বলে, খরিশ একেবারে।

আমি বলি, খরখরে, খরিশ, খনখনে, খশখশে, খপখপে, খটখটে, খ্যাংরা ঢ্যাংড়া...

সবাই হাসে। একটা পিসি বলে, হ্যাঁরে, কিছু মনে করিস না, মা-মরা বলে বাচ্চাটাকে তোরা কি একটু যত্নও করিস না!

ছোটপিসির বোধহয় রাগ হয়, বলে, ও হল আখ্‌কুটির সর্দার। এই নতুন জামা আসছে দু'দিনেই সেটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একসা। পায়ে চটি পরবে না, চান করতে তেল, সাবান মাখবে না, চুল আঁচড়াবে না। ন'বছরে পড়লো, ও কি আর বাচ্চা আছে না কি? এখন তো নিজের কাজ নিজেরই করার কথা।

—যাই বলিস আর তাই বলিস মা-পরা মেয়ের আর একটু বেশি আদর-যত্ন দরকার— পিসিটা বলল।

আমার কেমন রাগ হয়ে যায়। বলি, মা-মরা, মা-মরা, মা-মরা! বেশ করেছি মাকে মেরে ফেলেছি। সব্বাইকে মারবো। ঠাম্মাকে, ব-পিসিকে, ছো-পিসিকে, কাকুকে, জেঠুকে...

ছোটপিসি বলে, 'দেখলি তো!' ওর গলায় রাগ, চোখে রাগ। উঠে আসে—'পুঁটুউ, যাও বলছি, যা-ও।' আমাকে ঠেলে বার করে দিতে থাকে ছোটপিসি। আর একটা পিসি বলে শুনতে পাই— কী বললো রে? মাকে মেরে ফেলেছি! এমন কথা কেউ নিশ্চয় ওকে বলেছে! এমা! বাচ্চা একটা অসহায়!

আর একজন আস্তে বললো, যাক গে যাক। পরের বাড়ির ব্যাপার! আমাদের কী!

ঠাম্মার কী সুন্দর ফাটা ফাটা পায়ে বাসি আলতা লেগে থাকে। ফাটা ফাটা ঠোঁটে পানের রস। ঠাম্মার আঁচল থেকে সুন্দর সুন্দর রান্নার গন্ধ বেরোয়। আঁচল মুঠোয় নিয়ে গা ঘেঁষটে আমার দাঁড়াতে ইচ্ছে করে ভীষণ। ঠাকুরপুজো করবার সময়ে ধূপ জ্বেলে দেয় ঠাম্মা, দীপ জ্বালে, ঠাকুরকে ফুল দেয়, আমি হাতজোড় করে বসে থাকতে চাই, কিন্তু ঠাম্মা বলেন, সরে বোস পুঁটু, এখন পুজো করছি, ছুঁয়ে দিসনি।

—আমি তো চান করে এসেছি ঠাম্মা!

—হোক, তুই জন্ম-নোংরা। যেমন চিরকুট্টি ফ্রক, তেমনি জটবাঁধা চুল, হাতে পায়ে সবসময়ে ধুলো! কোত্থেকে এত ধুলো পাস?

—ঠাম্মা, আমিও পুজো করবো, কল্কুর দিয়ে পিদ্দিম জ্বালাবো!

—ওই যে বললুম, তুই নোংরা।

—ব-পিসিকে বলো না একদিন আমায় ঘষে ঘষে ঘষে ঘষে চান করিয়ে দেবে। ধুঁধুলের ছাল দিয়ে! আমি চেঁচাবো না, কিচ্ছু বলবো না। গরম জলে বেশ করে। আমি পায়ের নখে নখপালিশ পরবো ছো-পিসির মতোন। একটা সিল্কের কাপড় পরবো।

—কোথায় পাবি সিল্কের কাপড়? আমার পুজোর কাপড়ে হাত দিবি না। আর তোর পিসিরা? তবেই হয়েছে!

—তোমাদের কাপড় পরবো না ঠাম্মা। ওই যে আলমারি আছে...

—কোন আলমারি?

—ওই যে রাঙাদার ঘরে! চকচকে আরশুলো রঙের আলমারি আছে, ওতে অনেক সিল্কের বেনারসি আছে...ওখান থেকে দাও।

—ও রে বাবা, ও তো তোর মায়ের আলমারি। ওতে হাত দিলে তোর বাবা আমায় মেরে ফেলবে!

বাবা ঠাম্মাকে মেরে ফেলবেন? একেবারে? ছবিটা আমি তক্ষুনি দেখতে পেলুম। ঠাম্মা মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন। উল্টেপাল্টে যাচ্ছেন, বাবা ঠাম্মার পেটে এইসান এক লাথি! ঘুষি, ঘুষি, ঘুষির পর ঘুষি, পেছনে একটা চাকা লাগানো ফলের গাড়ি। ঠাম্মা তার ওপরে পড়ে গেলেন, গাড়ি উল্টে গেছে রাস্তাময় কমলালেবু আপেল, বেদানা গড়াচ্ছে, গড়াচ্ছে। ব্লাউজ ধরে রাঙাদা ঠাম্মাকে ওঠাচ্ছেন, আব্বার এক ঘুষি, ঠিক মুখের ওপর। ঠাম্মা পড়ে গেলেন, মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঠিক এমনি ছবি টি.ভিতে রোজ-রোজ হয়। রাঙাদা ঠাম্মাকে এমনি করে মেরে ফেলবেন?

—কেন ঠাম্মা?

—তোর মা স্বর্গে গেছে তো! তার জিনিসপত্তর এখন তোর বাবার প্রাণ। নিজে ঝাঁড়ে পোছে, কাউকে হাত দিতে দেয় না। দেখিস না ঘরে চাবি দিয়ে চলে যায়। ওই একরকমের হয়ে গেছে!

যাঃ। তাহলে আর আমি কী করে পুজো করবো? ঠাকুরঘরে সিংহাসনের ওপর নাড়ুগোপাল ঠাকুর আছেন। তার এপাশে ওপাশে লক্ষ্মীর পট, গণেশঠাকুরের পট, নারায়ণের পট, আরও কত কত ঠাকুর ওপরে নীচে। আমি কী সুন্দর সব্বাইকে ফুল-তুলসী দিতুম, কল্কুরের দপদপে দীপ জ্বালিয়ে পুজো করতুম, তারপর ছোট্ট থালায় এলাচদানা আর পুঁচকি গেলাসে জল দিয়ে উপুড় হয়ে পেন্নাম করতুম আর বলতুম— ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমাকে মায়ের মতো করে দাও, হে গণেশ, হে লক্ষ্মী, হে নাড়ুগোপাল আমি তোমাদের খুব ভক্তি করছি। দয়া করে আমাকে মায়ের মতো...

—কিন্তু বড়পিসি আমাকে ধুঁধুলের ছাল ঘষে চান করিয়ে না দিলে, আর ওদের রাঙাদা আলমারি খুলে একখানা সিল্কের কাপড়ও না নিতে দিলে আমি কী করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবো? কী করে আমার ভক্তি বোঝাবো? শুদ্ধু একখানা সিল্কের কাপড়ের অভাবেই কি তা হলে আমার মায়ের মতো হওয়া হচ্ছে না?

ভীষণ রাগ হয়ে যায় আমার, ঠাম্মা পুজো শেষ করে যে-ই আমাকে পেসাদ দিতে এসেছেন অমনি আমি ঠাম্মার পুজোর কাপড়ের আঁচল দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিই।

—অ্যাঁ?—টাম্মা ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেন আমার গালে! আমার এত ভীষণ ভীষণ লাগে! ঠিক সেই সিনেমার লোকেদের মতো আমি মাটিতে ধড়াম করে শুয়ে পড়ি, উল্টে-পাল্টে কাঁদি।

দাদু তো একজন শোয়া মানুষ! পুজোর ঘরের পাশেই দাদুর ঘর। শুয়ে শুয়েই দাদু চ্যাঁচান— কী হল? কী হল? তোমরা কি আমাকে একটু শান্তিতে হরিনামও করতে দেবে না? আমার কি যাবার সময় হয়নি? হে ভগবান! এত অশান্তি! এত অশান্তি!

আমি দাদুর ঘরে ছুটে যাই। নালিশ করি। দাদু তো আর সবার মতো না! হাঁটতে পারেন না, উঠতে পারেন না, কেউ এনে না দিলে দাদু খেতেই পারেন না। দাদুর বিছানায় বাচ্চাদের মতো অয়েল-ক্লথ পাতা থাকে, আমি দেখেছি।

—দাদু, ও দাদু! ঠাম্মা আমাকে ভীষণ ভীষণ জোরে চড় মেরেছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি।

—আমার পুজোর কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছিস সে কথাটা বললি না?

—আমি তো পুজো করতে চাইছি, কেউ আমাকে পুজো করতে দিচ্ছে না কেন?

—আট বছরের মেয়ে পুজো করবে কোথাও শুনিনি বাবা! এত আবদার! এত আবদার! যা বলবে তাই! যা বলবে তাই!

—কোথায় তাই? আমাকে একটাও গোলাপি ফ্রক কিনে দিয়েছো? কাল আমাকে বাবা-কাকার মতো ডিমের রুটি করে দিয়েছিলে?

—সাতসকালে আমার অত সময় কোথায় যে তোমার খাঁই মেটাবো?

—আজ সকালেও তো দাওনি!

দাদু এবার চেঁচিয়ে ওঠেন— যাবে? যাবে তোমরা এখান থেকে? কী আপদ! কী আপদ রে বাবা! দু দণ্ড যে শান্তিতে জিরোবো তারও উপায় নাই।

আমি আজ বড়দের সঙ্গে খাচ্ছি। আজকে ভাইফোঁটা কি না! তাই উৎসব। বাবা কাকু, জেঠু সব্বার কপালে চন্দনের টিপ। পিসিদের মাথায় ধান দুব্বো লেগে রয়েছে। খেতে খেতে বাবা বললেন, আট বছর বয়স হয়ে গেল, ওকে তোমরা স্কুলেও দিতে পারোনি? একটু কাণ্ডজ্ঞানও কি নেই তোমাদের?

ঠাম্মা ভয়ে ভয়ে বললেন, মেয়েটা যে তোমার বাবা, তুমি কিছু না বললে...

—আশ্চর্য কথা! ও কী খাবে, কী পরবে সেগুলো কি আমি ঠিক করি? জিতু তুমি যত শিগগির সম্ভব ওকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করো।

আমার তখন খুব সাহস হয়, আমি বলে উঠি, আমি রিয়াদের ইস্কুলে ভর্তি হবো। লাল স্কার্ট, সাদা জামা, লাল ফিতে...

কাকু বললো, বয়স হিসেবে তো ওর ক্লাস থ্রিতে পড়া উচিত। কিন্তু টু-থ্রিতে তো আজকাল ভর্তি করা অসম্ভব ব্যাপার!

—তা আগে তোমাদের সে খেয়াল হয়নি কেন? আমার মেয়ে ঠিক আছে, তো আমাকে মনে করিয়ে দিলেও তো পারতে!

—আমি চেষ্টা করছি—কাকু বললো।

'আমার মেয়ে' 'আমার মেয়ে' আমি দুপুরবেলা দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে শব্দগুলো ওল্টাই, পাল্টাই। আবার রাত্তিরবেলা শুয়েও যতক্ষণ ঘুম না আসে শুনতে পাই একটা ভারী গলা— 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে।' আমি খেলা করি শব্দদুটো নিয়ে।

— কোন মেয়ে?

—পুঁটু মেয়ে।

—কার মেয়ে?

—আমার মেয়ে।

—কোন আমার?

—বাবার আমার।

—কোন বাবা?

—পুঁটুর বাবা, পুঁটুর বাবা, আমার বাবা—।

এইভাবে খেলতে খেলতে আমি একদিন ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাই। ক্লাস থ্রিতেই। আমি কি না 'আরে ছিছি রাম রাম বোলো না হে বোলো না' আব্রিত্তি করতে পেরেছি! একশটা আমের দশটা পচা বেরোলে, বাকিগুলো চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে, ক'টা পড়ে থাকবে— বলতে পেরেছি!

বড়দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, পুঁটু ছাড়া ওর আর কোনও নাম নেই?

কাকু বললো, না, মানে আমরা তো সত্যিই পুঁটুটা ঠিক...

—বেশ তো আপনি একটা নাম দিয়ে দিন না।

কাকু মাথা চুলকোয়—আমি, মানে নাম...

দিদিমণি বলেন, পুঁটু। তুমি বলো না তোমার কোন নাম ভালো লাগে!

আমি বলি, সুরূপা।

—না না, কাকু হাঁ হাঁ করে ওঠে— ওটা বউদি। মানে ওর মায়ের নাম। উনি মারা গেছেন।

—বেশ তো, ওর যখন ওই নামটাই পছন্দ একটু উল্টে-পাল্টে স্বরূপা করে দিই?

—স্বরূপা সুরূপা... কাকু আওড়াতে

থাকে... আমি বরং একটু বাড়ি থেকে...

—দেখুন, প্রিতে একটাই মাত্র ভেকেন্সি আছে বলে, আর ও খুব ভালো কোয়ালিফাই করতে পেরেছে বলে একশ ত্রিশটা অ্যাপ্লিক্যান্টের মধ্যে ওকে নিলাম। সময় নষ্ট করলে পারবো না। আপনি যখন অভিভাবক হিসেবে এসেছেন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—ঠিক আছে, কী রে পুঁটু স্বরূপা ঠিক আছে তো?

আমি বড় করে ঘাড় নাড়ি। ভীষণ পছন্দ। মায়ের নামের সঙ্গে কী মিল! এইবার একটু-একটু করে আমি মায়ের মতো হয়ে যাচ্ছি।

পাড়ার ইস্কুল। লাল স্কার্ট ইস্কুলে যাওয়া হল না বলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে কিছু. কাকা বললো, অত দূরে তোকে নিয়ে কে যাওয়া-আসা করবে? রিয়াদের গাড়ি আছে তাই রিয়া যেতে পারে।

—তোমরাও একটা গাড়ি কেনো—আমি বলি।

—কেমন করে কিনবো?

—দোকানে যাবে, বলবে আমাদের স্বরূপা ইস্কুলে যাবে, ওই শাদা গাড়িটা দিন তো!

রিয়াদের কালো গাড়ি, আমাদেরটা বেশ শাদা হবে।

কাকু হাসতে লাগলো—গুণের গুণমণি! গাড়ি কিনতে টাকা লাগবে না বুঝি? চাইলেই দিয়ে দেবে?

—তা কেন? তোমার তো টাকা আছে, চাকরি করে টাকা পাও যে!

—সে তো দু'দিনেই ফুটুস। ওতে কি হয়? লাখ লাখ টাকা চাই। যাক গে, এই স্কুলেও তো সবুজ স্কার্ট পরতে পাবি। নতুন জুতো। সবুজ রিবন। স্কুল-ব্যাগ। টিফিন-বাকসোটা লালের চেয়ে সবুজ অনেক ভালো। আবার কেমন বাড়ির কাছে। হেঁটে হেঁটেই চলে আসতে পারবি।

কাকুকে কী করে বোঝাই হেঁটে হেঁটেই চলে আসতে আমি চাই না। কাছে নয়, দূরে, অনেক অনেক দূরে আমি চলে যেতে চাই। ট্রামে চড়ে, বাসে চড়ে, ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি সেই দোতলা বাড়িটা, ভুলে যাচ্ছি। দূর থেকে ছবি দেখার মতো দেখতে পাচ্ছি... পুজোর কাপড় পরা ঠাম্মা, উল বুনছে বড়পিসি। কিনুনি দুলিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে ছোটপিসি, কাকু অফিস যাচ্ছে, জেঠু কলেজ যাচ্ছে, অনেক বেলায়। দাদু শুয়ে শুয়ে খাচ্ছেন গলা গলা দলা দলা ভাত, মসমস শব্দ, একটু ফাঁক দরজাটা। সিগারেটের গন্ধ, আমি উশ্‌শ্‌শ্‌ করে নিয়ে নিচ্ছি গন্ধটা। আমি ভালোবাসি, দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে। যেখান থেকে ছবির মায়ের মতো ওদের দেখতে পাবো। ওরা কেউ আমায় দেখতে পাবে না।

এ মা! এতদিন তুই স্কুলে পড়তিসই না! ক্লাসের মেয়েরা ঠেচামেচি করে জিজ্ঞেস করে।

*উনি তো নার্সদিদি*

—কেউ ভর্তি করে দ্যায়নি, কী করে পড়বো?

—কেন? তোর বাবা? তোর মা?

—আমার মা নেই, একটু ভেবে বলি, আমার বাবাও নেই।

সবাই অমনি চুপ হয়ে যায়। কেমন কাঁদো-কাঁদো! সবচেয়ে লম্বা মেয়েটা বলে, ইস্‌স! বাবা-মা নেই, এমন আমি ভাবতেও পারি না!

আমার কেমন খারাপ লাগে। আমি বলি, পাঁচখানা কাটলেট, লুচি তিনগণ্ডা গোটা দুই জিবেগজা, গুটি দুই মণ্ডা/ আরও কত ছিল পাতে আলুভাজা, ঘুঙনি/ ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি।

ওরা হেসে ওঠে।

—তুই বানালি?

—হ্যাঁ, বানালুম।

—আরও বানাতে পারিস?

—আমি আরও বলি, আবোল-তাবোল, খাই-খাই, খুকুর ছড়া— থেকে।

—ধ্যাঃ, স-ব তুই বানালি? এক্ষুনি এক্ষুনি?

—এক্ষুনি নয়, আগে বানিয়ে রেখেছিলুম। আমার এখন খুব ভালো লাগছে।

দিদিমণি ক্লাসে এলেন, নাম-ডাকা হয়ে গেলে একটা মেয়ে, তার নাম এখনও জানি না, তড়বড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দিদি, একটা কথা বলবো?

—কী কথা? এক্ষুনি এমনি টয়লেট পেয়ে গেল?

—না, না। আমাদের একজন নতুন মেয়ে এসেছে। দেখুন ওই যে স্বরূপা, ও না পদ্য বানাতে পারে।

দিদি বললেন, তাই নাকি? বলো তো?

দিদিমণির রাগী মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল, আমি উঠে দাঁড়িয়ে চুপটি করে থাকি।

মেয়েটা বললো, বল না, সেই যে বলছিলি— পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হারু ফেরেন বাড়ি— বল না।

আমি চুপ।

দিদিমণি বললেন, এটা ওর নিজের বানানো কেন হবে? এ তো সুকুমার রায়ের লেখা। আমি শুনেছি ও অ্যাডমিশন টেস্টে খুব ভালো কবিতা বলেছিল।

—না দিদি, মেয়েটাও ছাড়বে না, ও বলেছে ওটা ওর নিজের বানানো।

—তুমি বলেছো? কী নাম যেন তোমার?

—স্বরূপা।

—সুকুমার রায়ের কবিতা তুমি নিজে লিখেছো বলেছো?

আমি বলি, না।

—হ্যাঁ দিদি, ও বলেছে, বলেছে, বলেছে! সব্বাই হই-হই করে ওঠে।

—স্বরূপা, দাঁড়াও।

আমি দাঁড়াই।

—কানে হাত দাও, দু কানে।

আমি দিই না।

—দাও বলছি! দা—ও! আমি বড়পিসি ছোটপিসি ঠাম্মা সবার গলা শুনতে পাই।

তখন আমি কানে হাত দিই।

—হ্যাঁ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, যতক্ষণ না আমি বসতে বলছি।

দিদিমণি পড়াতে থাকলেন। কী ছাইভস্ম আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ইচ্ছে করছে এই মেয়েগুলোকে ঘুষি মেরে মুখ ফাটিয়ে দিই। এমন মারবো না যে বাছাধনদের আর নালিশ করতে হবে না।

কিছুক্ষণ পর দিদিমণি বললেন, আর কখনও মিথ্যে কথা বলবে?

আমি মুখে মুখে জবাব দিই— মিথ্যে কথা বলিনি।

—আবার বাজে কথা বলছো?

—আমি মজা করেছিলুম। কী করে জানবো ওরা জানে না!

—আচ্ছা ঠিক আছে, বসো। এমন মজা আর করবে না।

ক্লাস ভেঙে গেলে কতকগুলো মেয়ে বললো, কীরে, কেমন খেলি? আমি মুখ বাঁকিয়ে বললুম, 'আবোল-তাবোল জানে না।' 'খাই-খাই' জানে না আবার ক্লাস থ্রির মেয়ে হয়েছে! ইঃ!!

নালশে মেয়েটা বললো, তুই একটা মিথ্যেবাদী।

আমি বললুম, তুই একটা নালশে, মুখ্যু, বোকা...

তখন ও বললো, তুই তো একটা কেলে-কুচ্ছিত, বিশ্রী!

আমি রাগে অন্ধ হয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। অন্য সব মেয়েরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

লম্বামতো মেয়েটা এসে তাড়াতাড়ি আমাদের ছাড়াতে লাগলো।

—এই কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? ঠিক আছে শোধবোধ? শোধবোধ!

আমি উঠে দাঁড়াই, আমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। ও উঠে দাঁড়ায়, ওর কপালে আলু। দু'জনেরই চুল উলোঝুলো, জামাকাপড় ধুলোয়-ধুলো।

আমি তো মিথ্যেবাদী। তাই বাড়ি গিয়ে বলি, খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি। বিচ্ছিরি স্কুল, বিচ্ছিরি দিদিমণি, বিচ্ছিরি মেয়েরা...

—তোর কি কিচ্ছু পছন্দ হয় না।

আমি গোঁজ মুখে বসে থাকি। আমার আর ইস্কুলে যাবার শখ নেই।

কিন্তু তাই বললেই কি হয়? স্কুলে আমাকে যেতেই হয়। বাবার কড়া হুকুম। রাঙাদার! বাপ রে! আমাকে ওরা বলে রাক্কুসি, আমিও ওদের বলি, শূর্পনখা, তাড়কা, অলম্বুষা, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ। আমি রামায়ণ সব জানি, ছোটদের মহাভারত পড়েছি, কতবার! ওরা কিচ্ছু জানে না। এমন কি ঘটোৎকচ যে ছেলে-রাক্ষস তা পর্যন্ত জানে না। খালি কটমটে নামগুলো শুনে দাঁত কিড়মিড় করে। আমি দূরে পালিয়ে গিয়ে বলি, আয়না ধর ধর, রাক্কুসিকে ধর, কাঁচা খেয়ে নেবো। অনেক ছুটেও ওরা আমাকে ধরতে পারে না। হেরো। কাঁচকলা! লবডঙ্কা।

তখন ওরা সবাই মিলে একদিন আবার দিদিমণির কাছে নালিশ করলো। দিদিমণিও আমাকে খুব বকলেন। আমিও বলি, আমাকে যে ওরা রাক্কুসি বলে ক্ষ্যাপায়, তার বেলা?

দিদিমণি বলেন, ছি, ছি, ছি। রূপ ঈশ্বরের দেওয়া। সবাই তো সমান হয় না। তাই বলে ওইরকম করে বলবে? তোমাদের একটা দয়ামায়া বলে জিনিস নেই?

কে চেয়েছে দয়ামায়া? আমার ভারি বয়ে গেছে চাইতে। আমি ওদের সঙ্গে ঘুরি না। একা একা থাকি। খেলার মাঠে সবার আগে পৌঁছে যাই দৌড়-রেসে। খেলাদিদি আমাকে হাইজাম্প শেখান, লংজাম্প শোখান। চু কিতকিত খেললে আমি বোঁ-ও করে ওদের কোর্টে গিয়ে যেটাকে সামনে পাই পেটে খোঁচা মেরে চলে আসি। কেউ আমাকে ধরতে পারে না। ধরবার সাহসই নেই। চোখগুলো কটমটে করে একটা কটকা মেরে যেমনি দৌড়ে যাই, ওরা ভয় পেয়ে যায়। আমাদের দল জেতে। আমাকে দলে নেবার জন্যে সব ছটফট করে। আমি কাউকেই চাই না। কোনও কথা বলি না। দিদিমণি যে দল ঠিক করে দেন সেই দলেই খেলি। একা খেলি, একা জিতি। দল জিতলো কি না জিতলো ভারি বয়ে গেল আমার!

এই করতে করতেই একদিন খুব মারামারি লেগে গেল।

ওরা বললো, এই, পেটে খোঁচা দিবি না।

আমি বলি, এই, রাক্কুসি বলবি না।

—রাক্কুসিকে রাক্কুসি বলবো না তো কী বলবো?

আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম, সামনে যাকে পেরেছি জাপটে ধরেছি, মারছি, কিল, চড়, ব্যাস ওরাও সেই আর একদিনের মতো সবাই মিলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমি পড়ে গেলুম, ওরা সবাই আমায় ঘিরে ধরে মারছে। চোখের পাতা ফুলে গেছে, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, হাতে কালশিটে। বড়দিদিমণির কাছে আমায় যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন আমার জামা ছেঁড়া, কাঁধ বেরিয়ে গেছে। ভীষণ বকুনি খাচ্ছে মেয়েগুলো। আমার যা আনন্দ হচ্ছে না!

মিনমিন করে একজন বলছে, পেটে খোঁচা দেবে কেন? মোর করতে হলে পেটে খোঁচা দিতে হবে?

বড়দি বলছেন, তাই বলে এইভাবে বারো তেরোজন ঘিরে ধরে মারবে তোমরা? তোমরা তো কাওয়ার্ড! সুচরিতা! এ তো গণপ্রহারের শামিল।

খেলার সুচরিতাদি কী বললেন আমি কিন্তু আর শুনতে পেলুম না। হঠাৎ আমার চারদিকে কারা হিজিবিজি করে হলুদ বনের কলুদ ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগলো, তারপর একটা মাঝরাতের মতো অন্ধকারের মধ্যে সব মিলিয়ে যেতে থাকলো— মেয়েরা, দিদিরা, স্কুলবাড়ি, আমাদের বাড়ি, ঠাম্মা কাকু জেঠু পিসিরা সব। খালি একটা অনেক উঁচু শূন্য থেকে আমি পড়ছি, পড়ছি। কোথায় পড়বো মা? তোমার কোলে?

কতক্ষণ পরে জানি না, আধা-চোখ খুলে দেখতে পাই একটা অচেনা ঘর, অচেনা জানলা, দরজা, সবুজ পর্দা। এটাই কি তাহলে স্বর্গ? যেখানে আমার মা থাকেন! এ মা! স্বর্গ এইরকম? আমি তো ভেবেছিলুম স্বর্গের ঘর লাটসাহেবের ঘরের চেয়েও বড়। সেখানে সব গোলাপি, তাছাড়া স্বর্গে এমন কিছু একটা ব্যাপার থাকবে যেটা আমি ভাবতেও পারি না। এ তো দেখছি জানা জিনিস সব! এই জানলা দরজাগুলো আলাদা হলেও, এরকম তো আমাদের বাড়িতেও আছে। এইরকম বিচ্ছিরি সবুজের কাছাকাছি কী যেন রঙের পর্দা তো আমাদের বাড়িতেও আছে। ঘাড় ফেরাতে গেলে দেখি ভীষণ ব্যথা! পাশ ফিরতে গেলে হাতে টান লাগলো। দেখি হাতের থেকে একটা সরু নল কোথায় যেন উঠে গেছে! আমার ডানপাশে একটা নিচু কাঠের পার্টিশন। তার ওপাশ থেকে সাদা শাড়ি পরা, মাথায় বড় সাদা রুমাল বাঁধা একজন ঢুকলেন। আমি চট করে চোখ বুজিয়ে নিয়েছি, ও হো এটা তো প্রকাশদাদুর হাসপাতাল। উনি তো নার্সদিদি...

হঠাৎ শুনি পার্টিশনের ওপার থেকে রাঙাদার গলা, ব্ল্যাক-আউটটা তা হলে বলছেন...

প্রকাশদাদুর গলা—হ্যাঁ ঠিক ওর মায়ের মতো, সেম সিম্পটম। ভালো করে পরীক্ষা না করে বলতে পারছি না অবশ্য।

রাঙাদা বললেন, আশ্চর্য!

—আশ্চর্যই বটে! এইটুকু একটা মেয়ের এত স্ট্রেস! বউমারটা বুঝতে পারি, তাঁর তো ছিল একেবারে মুখে সেলাই। কিন্তু রাজেন— এইটুকু মেয়ের...

রাঙাদা তাড়াতাড়ি বললেন, অত মার খেয়েছে। মারামারি করেছে... তার তো একটা!

—মারামারিও করেছে বলছো? শিওর? পড়ে পড়ে মার খায়নি?

কোনও সাড়া পাচ্ছি না।

ডাক্তারদাদু বললেন, যদি করে থাকে তো আশার কথা। তার মানে ও আজ রক্ষা করতে শিখছে, কাওয়ার্ডের মতো পালিয়ে বাঁচতে চায়নি! হারজিত লড়াইয়ে আছেই রাজেন। আজ হেরেছে... কাল জিতবে।

—কাওয়ার্ডটা বোধহয় আমাকেই বললেন কাকা!

—না, না। আমি কাউকেই তেমন কিছু বলতে চাই না। যে যার দায়টা ভালো করে বুঝে নিয়ে পালন করা চাই, নইলে দায় নিতে নেই। তুমি কী করেছো না করেছো তুমিই ভালো জানো বৎস। তবে তোমার কন্যা কালো, এক ধরনের কবচকুণ্ডল সে নিয়েই জন্মেছে। তার ওপর যা শুনছি— দশপ্রহরণধারিণী। দেখো, মানুষের মতো বাঁচতে ওর হয়তো বাবা-টাবার দরকার হবে না।

আস্তে, খুব আস্তে। কেমন ধরা-ধরা গলায় রাঙাদা বললেন, আ'য়াম সরি।

এটার মানে আমি জানি।—'আমি দুঃখিত।' আরও একটা জানি— 'কাওয়ার্ড' মানে 'কাপুরুষ।' 'কাপুরুষ' মানে? আমি জানি, কিন্তু বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আর কী যে সব হিজিবিজি ওঁরা দু'জনে বলাবলি করছিলেন, আমি কিচ্ছুতেই বুঝতে পারছিলুম না। আমার কানে শুধু লেগেছিল— 'মায়ের মতো, ঠিক ওর মায়ের মতো!' ব্যথা ভুলে গিয়ে আমি চোখ খুলে ফেলি, দেখি সামনে নার্সদিদি, আমারই মতো কালো, ঝুঁকে রয়েছেন আমার ওপরে। বললেন, বারে মেয়ে, হাসি ফুটেছে দেখছি! বাবা তো এসে গেছেন! দেখি হাতটা, একটা ইনজেকশন... কিচ্ছু লাগবে না... কী ব্যথা করছে না তো?

ব্যথা করছিল ঠিকই। কিন্তু আমি বলি, উঁহুহ্!

*অঙ্কন : অনুপ রায়*